The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 225-241, ISSN 2306-3920

বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে এদেশের চিত্রশিল্পীগণ

তরুন কুমার সরকার*

[**সার-সংক্ষেপ :** বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী নয়া উপনিবেশবাদী শাসনের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির ভাষাভিত্তিক জাতিয়তাবাদী চেতনার চরমতম রূপ। ১৯৭১ সালে প্রায় নয় মাস ব্যাপী এ যুদ্ধ চলে যার পরিসমাপ্তিতে উদ্ভব ঘটে স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশের। কিন্তু এ যুদ্ধের পটভূমি জুড়ে রয়েছে এক দীর্ঘ সময়কাল যখন পূর্ব পাকিস্তানের জনমানস এক সেক্যুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় অভিসিক্ত হয়। এ সময়কে বলা যায় বাঙালির স্বাধীকার অন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব যার সূচনা ঘটে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা প্রশ্নে বাঙালি ছাত্র-যুবাদের প্রাণ দানের ভেতর দিয়ে প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের বীজ রোপিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ভাষা-সংস্কৃতি-রাজনীতির সম্মিলিত স্রোত বেয়ে আসে একাত্তর; শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ অবধি সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলনে অন্যান্য অনেক শ্রেণী-পেশার মানুষের মতো এদেশের চিত্রশিল্পীগণ এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু অন্যান্যদের মতো চিত্রশিল্পীদের ভূমিকার বিষয়টি খুব বেশি আলোচিত হয়নি। বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলন ও তার চূড়ান্ত পরিণতি যে মুক্তিযুদ্ধ তার অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনা। আর বাঙালীর সে চেতনার উদ্বোধনে এক অনন্য ভূমিকা রেখেছেন দেশের চিত্রশিল্পীগণ। ১৯৫২, ১৯৬৯, এবং ১৯৭১-এর রাজনৈতিক আন্দোলনকে এরা তাঁদের সৃজন-কর্মের ভেতর দিয়ে নানাভাবে প্রভাবিত ও বেগবান করেছেন। চিত্রশিল্পীগণ একদিকে যেমন তাঁদের সৃজনীশক্তির বিচিত্র প্রকাশ ঘটিয়েছেন রেখা ও রঙে, তেমনি আবার তাঁদের অনেকেই শারিরীকভাবে প্রত্যক্ষ মিছিল-শোভাযাত্রায় উপস্থিত থেকে বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধকে চেতনাপুষ্ট করেছেন। কামরুল হাসান, মুস্তাফা মনোয়ার, কালিদাস কর্মকার, বিজন চৌধুরী, বীরেন সোম, প্রাণেশ মন্ডল, মূর্তজা বশীর, শাহাবুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ চিত্রশিল্পীদের পোষ্টার, ব্যানার, ম্যুরাল, দেয়াল লিখন বাঙালির সংগ্রামী চেতনা ও সংগ্রামকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এ প্রবন্ধে আমি বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে চিত্রশিল্পীদের নানামাত্রিক অবদানের প্রতি আলোকপাত করবার প্রয়াস পেয়েছি। এর ভেতর দিয়ে দুটি বিষয় স্পষ্ট হবে বলে আমার ধারণাঃ প্রথমত– মুক্তিযুদ্ধপূর্বকালীন সময়ে চিত্রশিল্পীরা কিভাবে আমাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা বিনির্মাণে ভূমিকা পালন করেছেন, এবং, দ্বিতীয়ত– মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তাঁরা কিভাবে যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে নতুন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রূপরেখা তৈরিতে কাজ করেছেন।]

চাবিশব্দ : স্বাধীকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ, চিত্রশিল্পীগণ, নয়া উপনিবেশ, ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশ।

* **তরুন কুমার সরকার :** সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকা :

স্বাধীন-স্বার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভেতর দিয়ে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে ১৯৭১ এর সে যুদ্ধ হঠাৎ করেই শুরু হয়নি; এর পেছনে দীর্ঘকালব্যাপী ক্রিয়াশীল ছিল বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী চেতনা। সে কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্তরপ্রেরণা। পূর্ববঙ্গের বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে যে নয়া রাজনৈতিক শক্তির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকতে দেখা যায় বাঙ্গালির স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক চেতনা। স্বতন্ত্র এ কারণে, বৃটিশ ঔপনিবেশোত্তর সময়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে পূর্ববঙ্গের বাঙালি জনগোষ্ঠী খুব দ্রুতই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিজেদের পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব ও আচরণের ভেতর দিয়ে পাকিস্তানের সমর্থক বাঙালি মুসলমানের মোহভঙ্গ ঘটে। পূর্ব বঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান যে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর কাছে নিছক একটি কলোনি সে বিষয়টি প্রাথমিকভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিতর্কের প্রশ্নে। উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাঙালিদের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ ও পরবর্তীকালে তাদের প্রাণপণ অবস্থান তাদের নয়া সাংস্কৃতিক চেতনার বহিপ্রকাশ। এ চেতনা বাঙালিদের রাজনৈতিক সংগ্রামের পথকে বেগবান ও প্রশস্ত করে। বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে এদেশের ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের অবদান অগ্রগণ্য। কিন্তু সে সমাজের ভেতর থেকেও চিত্রশিল্পীদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে তাঁদের নানারকম সৃজনীকর্মের ভেতর দিয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক দিকটি মূর্ত ও বেগবান হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের স্বাধীকার অর্জনের সংগ্রাম ও তার চূড়ান্ত পরিণতি যে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ- তার অন্তর্গত শক্তিটি ছিল সাংস্কৃতিক। সে শক্তি বাঙালি সংস্কৃতির ভেতর ও বাহির উভয় দিক থেকেই এসেছে। সেদিনের বাঙালি সংস্কৃতির সে বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় দেশের চিত্রশিল্পীগণ অপরিমেয় ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৫২ থেকে শুরু করে সমগ্র ষাটের দশক জুড়ে তাঁদের সে ভূমিকা অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলনের এক বিশেষ অধ্যায় ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান। সেখানেও চিত্রশিল্পীদের উজ্জ্বল উপস্থিতি রয়েছে। আর ১৯৭১-এর সশস্ত্র সংগ্রামকালীন সময়ে চিত্রশিল্পীগণ রঙ-তুলির আচড়ে প্রতি মূহুর্তে রাঙিয়ে তুলেছেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের চেতনাকে। সুতরাং তাঁদের সে ভূমিকার বিশেষত্ব এড়িয়ে বা বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস এবং সে সম্পর্কিত আলোচনা– দুই-ই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি, শিল্প ও শিল্পী :

স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি যে একে অপরের পরিপূরক তার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের স্বাধীকার আদায়ের আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ; কেননা স্বাধীন-স্বার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদ্বয়ের পেছনে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সমান্তরালে পরিচালিত ও প্রবাহিত হয়েছে বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন। পাকিস্তানী নয়া ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মৌল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংস্কৃতি ও রাজনীতির মেলবন্ধন। যে কারণে সংগ্রাম হয়ে উঠেছিল প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদী ও সৃজনশীল। সংগ্রামের সৃজনশীলতা যে কেবল সাহিত্যে ধরা পড়েছে এমন নয়; তার স্পষ্ট প্রকাশ ও বিকাশ হয়েছে চিত্রশিল্পীদের কর্মে, তাঁদের রেখায় ও রঙে। রাজনীতি ও সংস্কৃতির ওই সম্পর্ক এতটাই সম্পৃক্ত আর অপরিহার্য ছিল যে একটিকে আরেকটি থেকে পৃথক করা ছিল অসম্ভব। রাজনীতি যে জাতীয় মুক্তির আকাঙ্খায় আলোড়িত হয়েছে তার কারণ রাজনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করেছে তখন সংস্কৃতি যার অন্যতম কারিগড় ছিলেন এদেশের চিত্রশিল্পীগণ। বাঙালির জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রামের সাংস্কৃতিক সম্পৃক্তি বিষয়ে বলতে গিয়ে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান লিখেছেন- "এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে। তবে

ন'মাসব্যাপী এই সশস্ত্র সংগ্রামের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল প্রায় ২৪ বছরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বস্তুত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থাকার সময়ে আমাদের রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক সুবিচার এবং সাংস্কৃতিক অধিকার লাভের দাবি মিলেমিশে গিয়েছিল।" (আনিসুজ্জামান, ২০১৩:২৫)

সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল জাতিগত সার্বিক মুক্তি। মুক্তির বিষয়টিকে যে তিনটি ক্ষেত্রে চিহ্নিত করে দেখান যায় তা হচ্ছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক। শুরুটা হয়েছিল সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই; কেননা বাংলা ভাষার উপর পাকিস্তানী শাসকগোষ্টীর যে আক্রমণ তা ছিল বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংস করার রাজনৈতিক প্রয়াস। ১৯৪৮ ও ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক। ভাষার সঙ্গে যুক্ত ছিল অর্থনৈতিক সাম্য ও অধিকারের বিষয়টিও। ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে প্রমাণ হলো যে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিকভাবে একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী। সঙ্গে ছিল নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য। ভাষা, অর্থাৎ সংস্কৃতিই পথ করে দিয়েছে রাজনীতিকে সামনে এগুবার। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এ বিষয়ে আলোকপাত করে লিখেছেন- "বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলন ছিল একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। এ ছিল রাষ্টের বিরুদ্ধে জনগণের অভ্যুত্থান। মানুষ তার অধিকার চেয়েছে, ভাষার অধিকারই আপাতত, কিন্তু ডালিমের ভেতর যেমন অনেক কোষ থাকে, ওই দাবির অভ্যন্তরে তেমনি অনেক দাবি ছিল। মূলত বিষয়টি ছিল সংস্কৃতি; সংস্কৃতি রক্ষা ও বিকাশের জন্যই রাজনৈতিক অন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে একুশে ফেব্রুয়ারিতে।"(চৌধুরী, ২০১১:২১৯)

এসব বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে স্বাধীনতার জন্য সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি কতোটা জরুরি। পাকিস্তানের পত্তন হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। তীব্র এক সাম্প্রদায়িক চেতনা সে ধর্মবোধকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল; ধর্ম হয়ে উঠেছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অন্য নাম। কিন্তু ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে বাঙালি মুসলমানের অবস্থান হয় দ্বিতীয় শ্রেণিতে। পূর্ব পাকিস্তান পরিণত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে। নয়া রাষ্ট্র পাকিস্তানে ধর্মের ঐক্যের আবরণটি খসে পড়তে শুরু করে অবাঙালি শাসকগোষ্ঠীর সংস্কৃতিগত বিদ্বেষের সূত্র ধরে। বাঙালিদের মধ্যে মাতৃভাষার মর্যাদার দাবিতে, সংস্কৃতির সমুন্নতির প্রশ্নে সরব হয়েছে প্রথমত দেশের শিক্ষিত সমাজ; পরে তাতে যোগ দিয়েছে আপামর জনগণ। এগিয়ে থেকেছে ছাত্রসমাজ, তাতে নৈতিক সমর্থন যুগিয়েছেন শিক্ষকরা। রাজনীতি এসে মিশে পড়েছে স্বাভাবিকভাবেই, কেননা "উপরিকাঠামো হিসেবে সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক" হচ্ছে "রাষ্ট্র-রাজনীতি।"(উজ্জামান, ১৯৮১:১৩) স্বাধীনতার সঙ্গে সংস্কৃতির আন্তসম্পর্কের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে হাসান উজ্জামানের আলোচনায়:

> "....প্রতিটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনও বটে। উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। একটা পর্যায় পর্যন্ত উভয়ের দৃষ্টিগ্রাহ্য পার্থক্য লক্ষীভূত হয় এবং তা খেয়াল রাখা অতি অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও রাজনীতিক আন্দোলন উভয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উচ্চতর স্তর হোল রাজনীতিক আন্দোলন, যদিও সংস্কৃতির প্রতি পরতে পরতে থাকে, থাকবে রাজনীতি।"(উজ্জামান, ১৯৮১:১৩)

সুতরাং, বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন ও তার চূড়ান্ত রূপ মুক্তিযুদ্ধ-এর ভেতর দিয়ে বাঙালি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জাগরণ সাধিত হয়। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত সময় থেকেই পূর্ববঙ্গের সমাজ-রাজনীতিতে নতুন সুর ধ্বনিত হতে থাকে। শুরু হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন পথ চলা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক আন্দোলন তাতে বড় হয়ে উঠেছিল শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বাঙালির অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা। কিন্তু নয়া ঔপনিবেশিক শক্তির

বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিরোধ আন্দোলনের সূচনা ঘটে সাংস্কৃতিকভাবে এবং তা চলমান থাকে সশস্ত্র আন্দোলনের শেষ পর্যন্ত। কেননা যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্র ধরে মুক্তিযুদ্ধের অবতারনা তার মধ্যে একদিকে যেমন প্রধান হয়ে উঠেছে পূর্ব বঙ্গের ভূ-খন্ড গত স্বাতন্ত্র্য, তেমনি প্রবলভাবে কার্যকর থেকেছে বাঙালির ভাষাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক চেতনা। সে চেতনাকে নতুন মাত্রা দিয়ে বেগবান করতে এদেশের চিত্রশিল্পীগণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন।

ভাষা আন্দোলন ও শিল্পী সমাজ :

পুর্ব বাংলায় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সূচনা ঘটে **১৯৪৮**-এর শুরুতে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই। পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মহম্মদ আলী জিন্নাহর স্পস্ট ঘোষণা ছিল উর্দুর পক্ষে। এই পক্ষপাত ব্যক্তিগত নয়; এর মধ্যে অবাঙালি শাসকগোষ্ঠীর সম্মিলিত মানসিকতার প্রতিফলন ছিল। মানসিকতাটি ছিল জাতিগত অহম ও সাংস্কৃতিক বিদ্বেষ। জিন্নাহর ঘোষণার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য গভীর উদ্বেগের সঙ্গে ধরা পড়েছিল বাঙালি ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবিদের কাছে। শাসকগোষ্ঠীর ওই আচরণের ভেতর দিয়ে তাদের ঔপনিবেশিক মানসিকতার দিকটি পরিস্ফুট হয়। পাকিস্তানের নতুন ঔপনিবেশিক অভিপ্রায়টি উন্মোচিত হয়ে পড়েছিল ভাষার প্রশ্নে শাসকশ্রেণির সেই অবস্থানে। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম আঘাতটা এসেছিল সংস্কৃতির উপর, কেননা সংস্কৃতিকে কাবু করতে পারলে মানুষকে বশে রাখা সহজ।"(চৌধুরী, ২০১১:২২০) তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এসেছে ছাত্রসমাজের ভেতর থেকে; তাদের প্রতিবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন শিক্ষক-বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিকেরা। যতই দিন গড়িয়েছে প্রতিবাদকারী দলের পরিসর তত বেড়েছে; যুক্ত হয়েছে সাধারণ মানুষ এবং ফলশ্রুতিতে তা রূপ নিয়েছে জাতীয় জাগরণে। **১৯৫২** সালের একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তদানের প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র পূর্ব বাংলা জেগে উঠেছিল অভূতপূর্ব প্রতিবাদে। সে জাগরণ ছিল একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধের চেতনা তাকে ক্রমশই এগিয়ে নিয়ে যায় জাতীয় মুক্তির আকাঙ্খার পানে। বাহান্নর পথ বেয়েই রচিত হয় জাতীয় ইতিহাসের পরবর্তী ধারাক্রম। যে বিষয়টি লক্ষ্যনীয় তা হচ্ছে, ভাষা আন্দোলনে ছাত্র-শিক্ষক-রাজনীতিকদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি ইতিহাসের বয়ানে নানাভাবে চিত্রিত হলেও তাতে এদেশের চিত্রশিল্পীদের বিশেষ অবদানের বিষয়টি আমাদের জনপ্রিয় আখ্যানে তেমন স্থান পায় নি। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে আঁকাআঁকি ছিল এক প্রকার ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। তবু কতিপয় বাঙালি শিল্পীর প্রচেষ্টায় পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় চারুকলা নামক প্রতিষ্ঠানের। ছোট হলেও এর শিক্ষক-ছাত্ররা সূচনা লগ্ন থেকেই ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করে এ প্রসঙ্গে "ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা" নিবন্ধে শিল্পী বীরেন সোম লিখেছেন -

> "আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব, **১৯৫২** সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে চারুশিল্পীরা বিভিন্ন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। **১৯৫২** সালের **২১**শে ফেব্রুয়ারি ছিল আর্ট কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনীর উদ্বোধনীর দিন। ছাত্র ও শিক্ষকরা সেদিন প্রদর্শনী বন্ধ করে **১৪৪** ধারা অমান্য করে মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ইমদাদ হোসেন, মুর্তজা বশির, আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী, রশিদ চৌধুরী প্রমুখ।" (বণিক, ২০১৯:১৪-১৫)

ভাষা হলো সংস্কৃতির প্রধান বাহক ও নিয়ামক। মানুষ ভাষার ভেতর দিয়েই তার আত্মপরিচয় খুঁজে পায়; খুঁজে পায় নিজেকে। মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূলেও থাকে ভাষার কার্যকারিতা। চারুশিল্প হচ্ছে সৃজনী-কল্পনার সেই চর্চা যার ভেতর দিয়ে মানুষের সুকুমার বৃত্তির প্রকাশ ঘটে রঙ ও

রেখার বহুবর্ণিল আর বিচিত্র সংযোগে। চিত্রশিল্পীর স্বপ্ন ও কল্পনা যে নান্দনিক প্রকাশের অভিপ্রায়ে উন্মুখ থাকে, তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে জড়িয়ে থাকে ভাষা ও সংস্কৃতি; শিল্পী ও শিল্পীর ভূবনে স্বাধীনতা এক অনস্বীকার্য পূর্বশর্ত। কেননা স্বাধীনতা ব্যতীত ভাষা ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ চর্চা সম্ভব নয়। নব্য পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠী বুঝতে পারে যে সে রাষ্ট্রে তারা পরাধীন। পরাধীনতার এই শৃঙ্খল শিল্পীর মানসচেতনায় ধরা পড়ে নয়া পাকিস্তানের শুরুতেই। সংবেদনশীলতার নিরিখে সমাজের অন্যতম অগ্রবর্তী শ্রেণি হিসেবে চারুশিল্পীগণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন প্রতিরোধ আন্দোলনে। কেননা তাঁদের সৃজন-কল্পনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল সংস্কৃতি ও রাজনীতি। রাজনীতি ছিল এ কারণে যে সংস্কৃতি রাজনীতি নিরপেক্ষ নয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে অথচ সেই রাষ্ট্র কর্তৃক পূর্ব বাংলার সুদীর্ঘ শোষন-বঞ্চনার প্রেক্ষিতে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হওয়া অসন্তোষ, ক্ষোভ আর দ্রোহের বহিপ্রকাশ ঘটে নয়া উপনিবেশবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনের নানা পর্বে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২'র প্রথম পর্বে সংস্কৃতিই মূখ্য হয়ে সম্মুখবর্তী হয়েছে। স্বাধীনতার যে স্বপ্ন আর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আকাঙ্খা নিয়ে বাঙালি মুসলমান শামিল হয়েছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে, স্বাভাবিক ভাবেই তা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয় পাকিস্তান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে বাঙালির চারুশিল্প বিকশিত হয়েছে কলকাতাকে কেন্দ্র করে। হাতে গোনা যে কয়েকজন পূর্ববঙ্গীয় শিক্ষার্থী চিত্রশিল্পে পাঠ নিয়েছেন কলকাতায় তাঁরাই এবং তাঁদেরই প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আর্ট স্কুল' নামক প্রতিষ্ঠানের। যদিও 'ধর্ম রাষ্ট্র' পাকিস্তানে ছবি আঁকা ছিল একই সঙ্গে ধর্মবিরুদ্ধ ও রাষ্ট্রবিরুদ্ধ কাজ, তবু আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতারা পাকিস্তান রাষ্ট্রকে স্বীকার করেই নিয়েছিলেন বলা যায়। তবু তাঁদের ওই কাজ সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহও ছিল বৈ কি। কাজটি হয়েছে অজ্ঞাতে। কেননা, মুসলমানের জন্য "স্বতন্ত্র আবাসভূমি" পাবার যে উচ্ছ্বাস ও আনন্দ তা নিতান্তই স্বল্প সময়ের মধ্যে স্তিমিত হয়ে আসে। ধর্মীয় মোড়কের ছদ্মবেশে পাকিস্তান ছিল পূর্ববঙ্গের জন্য এক বীভৎস ঔপনিবেশিক শোষোক মাত্র। "মোড়কটা ছিল ধর্মীয়," কিন্তু "অভিপ্রায়টি ছিল নিষ্ঠুররূপে বৈষয়িক।"(চৌধুরী, ২০১১:২২০) পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকরা মোহমুক্ত হন পাকিস্তানের। "বাংলাদেশের চিত্রকলা প্রসংগ" শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুল ইসলাম বলেছেন-

> "১৯৪৭ সালের পর এখানকার বাঙালিরা তাদের ভারতীয় পরিচয় মুছে ফেলে, হয়ে ওঠে ঘোরতর পাকিস্তানী। এই 'পাকিস্তানী আদর্শ' তখন প্রধান একটি ইমোশনাল শক্তি হয়ে উঠেছিল যে, অনেক বাঙালীর বাঙালীয়ানাও তাতে কিছুটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। অবশ্য দু'চার বছরের মধ্যেই এই বিভ্রান্তির অবসান ঘটে এবং ভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের শক্তি পুনরুত্থান হয়।"(ইসলাম, ১৯৯৫:১৩)

বলা বাহুল্য, বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ রোপিত হয় ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে, এবং তা পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের যৌথ প্রবাহে বিকশিত হয়। পাকিস্তানের যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং সে রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের যে অবস্থান সেখানে চারুকলার চর্চা ছিল এক দুরুহ কাজ। যে স্বাধীন মানস নিয়ে শিল্পীরা সুকুমার বৃত্তির চর্চা ও বিকাশ ঘটাতে চাইলেন তা স্বাভাবিক কারণেই বাধাপ্রাপ্ত হলো। কিন্তু সে বাধা তাঁদের অবাধ্য করল। স্বাধীনতার আকাঙ্খায় বাধা বরং শিল্পীকে করে তুললো সৃষ্টিমুখর। সে সৃষ্টি ব্যক্তিগত অভিপ্সায় আচ্ছন্ন নয়; বরং তা তাঁর সমাজ ও সংস্কৃতির বৃহত্তর মুক্তির লক্ষ্যে। তাই শত প্রতিকূলতার মধ্যেও বৃদ্ধি ঘটে ঢাকা আর্ট স্কুলের। নজরুল ইসলাম লিখেছেন– "প্রচন্ড প্রতিকূলতার মধ্যেই ঢাকার আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর বিকাশ হয় কিছুটা দ্রুত লয়েই। প্রায় সাত বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫৫ সনের দিকেই ঢাকা আর্ট স্কুল একটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।" (ইসলাম, ১৯৯৫:১৬)

ঢাকা আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী-শিক্ষকদের সকলেই ছিলেন প্রগতিশীল। বস্তুত আর্টের বিষয়টিই প্রগতিশীলতার; যদিও এই ধারণা এখন আর স্বতঃসিদ্ধ নয়। ঢাকা আর্ট স্কুলের সকলেই বৃটিশ ঔপনিবেশিক কলকাতায় একটি উদারনৈতিক পাশ্চাত্য আবহে শিক্ষা লাভ করেছেন। ঢাকা আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জয়নুল আবেদিন প্রগতিশীল হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাই দেখা যাচ্ছে শিল্পী হিসেবে তিনি কেবল ছবি আঁকছেন না, যুক্ত হচ্ছেন রাজনীতির সঙ্গেও। জয়নুলের ছবি নিয়ে ১৯৪৫ সালে কলকাতায় প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। ফ্যাসিবাদ বিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে গড়ে ওঠা সংগঠনের সদস্য হয়েছিলেন তিনি। প্রথম প্রজন্মের জয়নুল ছাড়াও উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আমিনুল ইসলাম, মূর্তজা বশির, রশিদ চৌধুরী প্রমুখ। এদেরই আদর্শে-মতাদর্শে বিকশিত হয় ঢাকা আর্ট স্কুল তথা চারুকলা ইন্সটিটিউট। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন বাঙালি চারুশিল্পীদের প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করে; তরুণ শিল্পীরা রাত জেগে পোষ্টার এঁকেছেন, তাঁদের সে পোষ্টার হয়ে উঠেছে জাতীয় জাগরণের প্রতীক। তাঁরা যোগ দিয়েছেন রাজপথের মিছিলে। বস্তুত বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামে যে সাংস্কৃতিক সংযোগ ঘটে তাতে এক বড় ভূমিকা রাখেন দেশের চারুশিল্পীগণ। বাংলাদেশের স্বাধীকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ সংগ্রামের অন্তরপ্রেরণা হিসেবে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি সংস্কৃতির অপূর্ব ও অনবদ্য ক্রিয়াশীলতা। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম উপকরণ হচ্ছে পোষ্টার। বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলনের মৌল প্রতীক যে শহীদ মিনার তার সৃজন, নির্মাণ চিত্রশিল্পীদের মাধ্যমেই হয়েছে; হামিদুর রহমানের নকশার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রথম স্মৃতি-স্মারক।(ইসলাম, ১৯৯৫:৫৩) প্রতিষ্ঠান হিসেবে চারুকলা বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র; বাংলা একাডেমিকে যেমন বলা হয় বাঙালির মননের প্রতীক। মুক্তিযুদ্ধ মূলত বাঙালির সুদীর্ঘ স্বাধীকার আন্দোলনেরই স্বাভাবিক ও চূড়ান্ত পরিণতি। স্বাধীন ও স্বার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উদ্ভবের সুদীর্ঘ কালপরিসর জুড়ে দেশের চিত্রশিল্পীগণ অনন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁরা একদিকে যেমন ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বেগবান করেছেন তাদের সৃজন-কল্পনাকর্মের নানামুখী প্রকাশে ও প্রয়োগে; তেমনি আবার নিজেরাও তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার জন্য প্রেরণা পেয়েছেন ভাষা আন্দোলনের কাছে। বস্তুত ভাষা আন্দোলন বাঙালির সাংস্কৃতিক রূপরেখায় ও জাতিগত ধারণায় নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়ে অপার সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে। সে সম্ভাবনাকে তাৎক্ষণিক প্রয়োগের ভেতর দিয়ে কাজে লাগিয়ে চারুশিল্পীগণ স্বাধীকার আন্দোলনকে গণমানুষের কাছে চাক্ষুষ করে তোলেন। তাই দেশের স্বাধীকার আন্দোলনের সঙ্গে একসূত্রে মিশে রয়েছে চারুকলা আন্দোলনের বিষয়টিও। সঙ্গত কারণেই কেউ কেউ ঢাকাকেন্দ্রিক চারুকলা আন্দোলনকে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। যেমন "বাংলাদেশের প্রগতিশীল চারুকলা"য় বলা হয়েছে-

> "চারুকলা আন্দোলনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি এসেছে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক (তথা রাজনৈতিক) আন্দোলনের মাধ্যমে। ভাষা আন্দোলনে ঢাকার চারুকলার তরুণ ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের সীমিত চিত্রাংকন শৈলীর হাতিয়ার নিয়ে। পোস্টার, ব্যানার এঁকে তারা ভাষা আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা নিয়েছে।"(ইসলাম, ১৯৯৫:৪৫)

চিত্রশিল্পীদের/চারুশিল্পীদের কৃত পোষ্টার বাংলাদেশের সমগ্র স্বাধীকার আন্দোলন জুড়ে প্রত্যক্ষ প্রেরণা জুগিয়েছে; পোষ্টারের প্রত্যক্ষ ভাষা ও তার প্রতীকি ব্যাঞ্জনায় উদ্দীপ্ত হয়েছে গণমানুষের সম্মিলিত চেতনালোক। সেসব পোষ্টারে জনগোষ্ঠীর ভেতরের ক্ষোভ, দাবী, আবেগ-আকাংখা, স্বপ্ন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। এসব পোষ্টার-ব্যানারের শিল্পমূল্য যা-ই হোক না কেন তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য অপরিসীম। ভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালে সংঘটিত হলেও সে ঘটনার সর্বব্যাপী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব কার্যকরভাবে চলমান থাকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ভেতরেও। আর এই চলমানতার

পেছনে চারুশিল্পীদের একটি নিবিড় ভূমিকা ছিল। কেননা তাঁরা আন্দোলনের প্রতিটি পর্বেই যুক্ত থেকেছেন তাঁদের সৃজনশীল, বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারিরীক প্রয়াসের মাধ্যমে। পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে এ ভূ-খন্ডের নবজন্মের বীজ রোপিত হয়েছিল যার ক্রমবৃদ্ধি ও বিকাশ অভূতপূর্ব অগ্রগামীতায় আর অপার সম্ভাবনায় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে একাত্তরের মহালগ্ন অবধি। এই সমগ্র সময় জুড়ে চারুশিল্পীগণ পোষ্টার-ব্যানার রচনার পাশাপাশি যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন তা হচ্ছে বিভিন্ন প্রকাশনা শিল্পের সাথে যুক্ত থাকা। গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে তাঁদের এই সংযুক্তি-সম্পৃক্ততা সেসময়ের প্রকাশনাকে সাংস্কৃতিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করেছে। একুশ কেন্দ্রিক এমন এক প্রকাশনা হচ্ছে "একুশে ফেব্রুয়ারি" নামক সংকলন যার মধ্যে ভাষা আন্দোলনের চেতনাপুষ্ট লেখা আর ইতিহাসের নানা উপাদান সন্নিবেশিত হয়েছিল। চারুশিল্পীদের হাতের নানা কাজ, যেমন- তাঁদের আঁকা প্রচ্ছদ, একুশের ঘটনাবলীর নানামাত্রিক ইলাস্ট্রেশন সে সংকলনকে সব শ্রেণির মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। ছবি আর লেখার সমন্বয়ে একুশের সংকলন হয়ে উঠেছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের এক অনবদ্য স্মারক। "একুশে ফেব্রুয়ারি" শীর্ষক সে সংকলনের বিবরণ দিয়ে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান লিখেছেন-

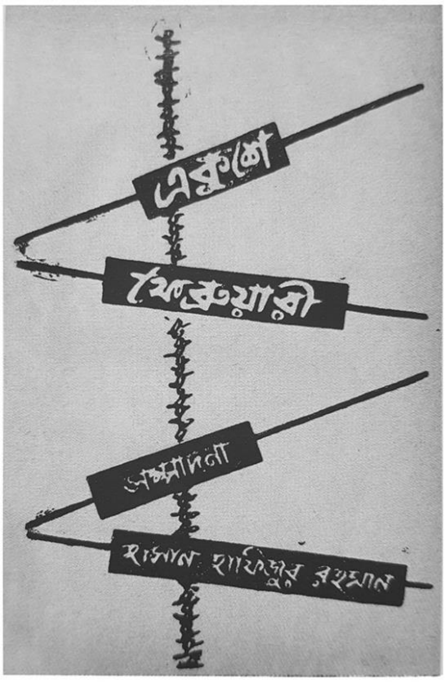

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনগ্রন্থের প্রচ্ছদপট (১৯৫৩)
প্রচ্ছদশিল্পী : আমিনুল ইসলাম

> "১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান *একুশে ফেব্রুয়ারি* নামে গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-ঘটনাপঞ্জির একটি সংকলন প্রকাশের উদযোগ নিলেন। স্থির হলো, তার প্রচ্ছদ আঁকবেন আমিনুল ইসলাম আর বিজন ও মূর্তজা বশির করে দেবেন কালি ও কলমের স্কেচ এবং কাঠখোদাই। তাই হলো। সাদা জমিনের ওপর রক্তরঞ্জিত কাঁটা তারের ছবি দিয়ে আমিনুল প্রচ্ছদ করে দিলেন। প্রচ্ছদের অক্ষরবিন্যাসও হলো সাদামাটা– যাতে কাঁটাতার থেকে দৃষ্টি সরে না যায় পাঠকের। বিজন ও বশির ছবি আঁকলেন মিছিলের, পোস্টার হাতে মাটিতে পড়ে যাওয়া শহিদের।"(আনিসুজ্জামান, ২০১৩:১৬৩)

চারুশিল্পীদের সহযোগে প্রকাশিত *একুশে ফেব্রুয়ারি* সংকলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব ও সাংস্কৃতিক মূল্য কতটুকু ছিল তা বোঝা যায় ওই সংকলনের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর ভীতি দেখে। সংকলন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন বস্তুত পূর্ব বাংলার মানুষকে এক বড়ো ধাক্কা দিয়েছিল জেগে উঠবার জন্যে। আর সে জাগরণের মূলে চিত্রশিল্পীরা বাঙালি সমাজের অগ্রগণ্য একটি শ্রেণি হিসেবে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছেন। বলা যায় শ্রেণিগতভাবে শিল্পীরা ছিলেন রাজনীতি সচেতন। পাকিস্তান রাষ্ট্রে চিত্রাংকন ছিল শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ।(চৌধুরী, ২০১১:১২) তবু চারুশিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালিদের আগ্রহ-প্রচেস্টায় সরকার আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। যারা এর

শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন তাঁদের মধ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন তো ছিলেনই; আরো ছিলেন সফিউদ্দিন আহমেদ, কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক, খাজা শফিক আহমেদ, শফিকুল আমিন প্রমুখ শিল্পীগন। এঁদের ছাত্র হিসেবে যারা উজ্জ্বলতর স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁরা হলেন আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রহমান, বিজন চৌধুরী, মূর্তজা বশির, কাইয়ুম চৌধুরী, রশিদ চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, কাজী আব্দুল বাসেত, দেবদাস চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীগণ। এঁরা সকলেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার পন্থী ছিলেন। কমবেশি বিপ্লবী চেতনা এঁদের প্রায় সকলেরই ছিল। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান লিখেছেন– "আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের প্রায় সকলেই এবং শিক্ষকদের অনেকেই বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে অন্তত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।"(আনিসুজ্জামান, ২০১৩:১৬২) **১৯৫২** সালের **২১**শে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালি ছেলেদের প্রাণদান অন্যান্য শ্রেণি-গোষ্ঠীর মতো চারুশিল্পীদেরকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে; তাঁরা এগিয়ে আসেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার পথে। শিল্পীদের সুগভীর সাংস্কৃতিক বোধ তাঁদেরকে রাজনীতিমুখী করেছে; কেননা ঔপনিবেশিক শাসন এই সত্য বুঝতে তাঁদেরকে সাহায্য করেছে যে সাংস্কৃতিক মুক্তি ব্যতীত যেমন রাজনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়, তেমনি আবার রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত সংস্কৃতির পক্ষে মুক্তভাবে বিকশিত হবার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। বাঙালির ঔপনিবেশবিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম তাই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক। শিল্পী বিজন চৌধুরীর আঁকা ও লেখা পোষ্টার একুশের বিদ্রোহ এবং আত্মদানের কাহিনী প্রবলভাবে তুলে ধরেছিল। শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী গ্রেফতার হয়েছিলেন। শিল্পী রশিদ চৌধুরী জগন্নাথ কলেজ পড়ুয়া যে ছাত্রের বাড়িতে ছবি আঁকতেন তার পিতা ছিলেন মুসলিম লীগের নেতা।(আনিসুজ্জামান, ২০১৩:১৬৩) এই দুই ঘটনা প্রমাণ করে বাহান্নর রক্তদানের প্রেক্ষিতে জেগে ওঠা ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা কী প্রবলভাবে প্রভাবিত ও সম্পৃক্ত করেছিল চারুশিল্পী ও তরুণ প্রজন্মকে। পিতাকে পেছনে ফেলে সন্তান এগিয়ে গেছে জাতীয়তাবাদের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে। ভাষা আন্দোলন শিল্পীদেরকে শুধু অনুপ্রাণিত করেই থেমে থাকেনি; সে আন্দোলনের ভেতর দিয়ে জেগে ওঠা সাংস্কৃতিক চেতনা তাঁদেরকে দ্রোহী করে তুলেছে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, তাগিদ দিয়েছে প্রতিবাদের ভাষা সৃষ্টিতে। সেই কাজ তাঁরা করেছেন তাঁদের নিজস্ব মাধ্যমে- পোষ্টার, ব্যানার, ছবি এঁকে; বিভিন্ন প্রকাশনায় ইলাস্ট্রেশন করে। একই সঙ্গে শামিল হয়েছেন প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের।

উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান ও চিত্রশিল্পীগণ :

ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তাবাদী চেতনার অংকুরোদগম হয় তা-ই পরবর্তীকালে ক্রমবিকশিত হতে থাকে রাজনৈতিক স্বাধীকারচেতনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে। সংস্কৃতি ও রাজনীতি একে অপরের মধ্যে অন্তপ্রবেশ করে উভয় উভয়কে শক্তিশালী করেছে। বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম কারিগর হিসেবে চিত্রশিল্পীগণ স্বাধীকার চেতনার সংগ্রামকে শাণিত করেছেন। ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাধীকারচেতনা বাঙালির রাজনৈতিক চেতনাকে বেগবান করেছে। তাই দেখা যাচ্ছে ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও থেমে যায়নি আন্দোলন। **১৯৫৬** সালে গৃহীত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেয়া হলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেমে যায়না। পাকিস্তানী শাষকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শোষণ-বঞ্চনার বিষয়টিকে, বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে বাঙালিদের বঞ্চনার বিষয়টিকেই সামনে নিয়ে এসেছিলেন রাজনীতিকেরা। তবে ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে জাগরূক নবচেতনাই ছিল সে রাজনৈতিক আন্দোলনের মৌলশক্তি। ভাষা আন্দোলন কেবল ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; তার অভিঘাত গিয়ে আছড়ে পড়েছে বাঙালির জাতীয় জীবনে। আর জাতীয় জীবন মানেই জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক জীবন। ভাষা আন্দোলন একই সঙ্গে ছিল সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক; কেননা সে আন্দোলনের ভেতর দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাঙালির বিদ্রোহের সুরটিই ধ্বনিত হয়েছিল।(চৌধুরী, ২০১১:২২০) উনসত্তরকে

তাই বলা যায় বাহান্নরই এক স্বাভাবিক পরিণতি যেমন একাত্তর হচ্ছে উনসত্তরেরই অবশ্যম্ভাবী উপসংহার। ষাটের দশকের অন্তিম লগ্নে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থান একাত্তরের সম্ভাব্যতাকে প্রকটিত করে তুলেছিল। সমগ্র ষাটের দশক জুড়ে বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলনে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক– এ দুটি ধারাই অত্যন্ত বেগবান ও সৃজনশীল হয়ে ওঠে। এ সময়ে বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে চারুকলা ও চারুশিল্পীদের কর্মতৎপরতা বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলনের ক্রমবিকাশকে ত্বরান্বিত করে। ষাটের দশককে বলা হয় বাঙালি সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের কাল। এ সময় ভাষা-সংস্কৃতি-রাজনীতির সম্মিলিত শক্তি বাঙালিকে ঠেলে নিয়ে যায় জাতিগত স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে। সাংস্কৃতিক কারিগড় হিসেবে চিত্রশিল্পীরা এসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। শিল্পী বীরেন সোম লিখেছেন–

> "আটষট্টির ২১শে ফেব্রুয়ারিতে শিল্পীরা রাজপথসহ বিভিন্ন স্থানে আলপনা আঁকার রীতি প্রবর্তন করেন। শহিদ মিনার থেকে আজিমপুর গোরস্থান পর্যন্ত পুরো রাস্তায় বাঙালি সংস্কৃতির নিদর্শনস্বরূপ অঙ্কিত আলপনা বাঙালির চেতনায় ভিন্ন একটি মাত্রা যুক্ত করে দিয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচারের চিত্র তাঁরা তুলে ধরেছিলেন জনসাধারণের কাছে–শহিদ মিনারে চিত্রপ্রদর্শনীর মাধ্যমে। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত শিল্পীরা বিভিন্ন বার্তা বহনকারী ব্যানারের প্রদর্শনী করে এসেছেন। ১৯৬৮ সালে বার্তা বহনকারী ব্যানারের সিরিজ এবং ১৯৬৯ সালের শহিদ মিনারে স্বরবর্ণের ব্যানার প্রদর্শনীর মাধ্যমে আন্দোলনে নবতর শক্তি সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন শিল্পীরা।"(বণিক, ২০১৯:১৫-১৬)

শিল্পী রফিকুন নবীর আঁকা
৬৯ সালে শহিদ মিনারে প্রদর্শিত স্বরবর্ণের ব্যানার সিরিজ

সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্বাধীকার আন্দোলন স্বাধীনতার পানে যদিও অগ্রসর হচ্ছে রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাত ধরে; তার ভেতরের স্রোতটি কিন্তু উৎসারিত হচ্ছে ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে। বাঙালির জাতিগত

চেতনা অপ্রতিরোধ্য বেগে প্রকাশিত ও বিকশিত হয়েছে তার মাতৃভাষাকে আশ্রয় করে। বর্ণমালা হয়ে উঠেছে জাতিগত স্বাতন্ত্রচেতনা ও আত্মপ্রকাশের মাধ্যম এবং স্বপ্ন ও সৃজনের প্রতীক। ভাষার নানামাত্রিক ব্যবহারের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। কবি-লেখকদের উচ্চারণ ও বর্ণনায় যেমন বিধৃত হয়েছে বাঙালির জাতিগত স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা, জীবন ও মনন, আত্মসচেতন হবার প্রক্রিয়া ও প্রয়াস; সেসব তেমনি চিত্রশিল্পীদের রেখা ও রঙের প্রক্ষেপণেও প্রকাশ পেয়েছে। একথা বলা নিস্প্রয়োজন যে সমগ্র ষাটের দশক জুড়ে পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে অভুতপূর্ব জাগরণ ঘটে, সৃষ্টি হয় অদৃষ্টপূর্ব ঐক্য, তার মর্মমূলে ক্রিয়াশীল ছিল ভাষা ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ। শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর নতুন শক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। বাহান্ন থেকে একাত্তরের প্রতিটি পর্বে বাঙালিকে প্রেরণা যুগিয়েছে তার ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক চেতনা। এ সময়কালের প্রতিটি একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালিকে নবউদ্যমে স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্খী করে তোলে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল সংস্কৃতি ও রাজনীতির সম্মিলিত শক্তির অবস্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে চারুশিল্পীদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এসময়ে রাজনীতির তারুণ্য-শক্তি বলে বিবেচিত ছাত্রনেতাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে আন্দোলনের সাংস্কৃতিক মাত্রাটিকে জাগরূক রাখেন চারুশিল্পীরা। সাধারণ ছাত্রদের শারিরীক উপস্থিতি আর মৌখিক শ্লোগানের সঙ্গে চারুশিল্পীরা বাড়তি যোগ করেছিলেন শিল্প ও সংস্কৃতির দৃশ্যরূপ। উল্লেখ্য যে ছেষট্টির ছয় দফা'র সঙ্গে যোগ হয়েছিল ছাত্রসমাজের এগার দফা; এবং এই এগার দফার মধ্যে চারুশিল্পীদের দাবীও অন্তর্ভূক্ত ছিল।(বণিক, ২০১৯:১৭) বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠা তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক-চূড়ান্ত সে সময়ে চারুশিল্পীদের ব্যাপক ভূমিকার কথা স্মরণ করে শিল্পী বীরেন সোম লিখেছেন-

> "উনসত্তরের বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন এক বিরাট বাঁক নিয়েছিল। এ বছর ২১শে ফেব্রুয়ারির শ্লোগান ছিল 'আজ পলাশ ফোঁটার দিন'। অর্ঘ্য হিসেবে শহিদ মিনারে শুধু ফুলের বলয় দেওয়ার বদলে 'অ' 'আ' অক্ষরের ফুলের বলয় এবং আন্দোলনের বার্তা বহনকারী স্বরবর্ণের ব্যানার শহিদ মিনারে টাঙানো হয়। এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল আর্ট কলেজের ছাত্র সংসদ। বাংলাদেশের প্রায় সব প্রতিষ্ঠিত শিল্পী এতে যোগ দিয়েছিলেন।"(বণিক, ২০১৯:১৬)

চিত্রশিল্পী বা চারুশিল্পী যে নামেই ডাকা হোক না কেন, বাঙালির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের স্বাধীকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধে উত্তোরণের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় তাঁদের অংশগ্রহণ, ভূমিকা ও অবদান বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। শিল্পীরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুই ভাবেই এককভাবে এবং শ্রেণিগতভাবে যুক্ত থেকেছেন। উনসত্তরের সেই প্রদর্শনীর "স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছিলেন মুস্তাফা মনোয়ার, শাহাদাত চৌধুরী ও রফিকুন নবী।"(বণিক, ২০১৯:১৬) শুধু উনসত্তরেই নয়, পরবর্তী কালের প্রত্যেকটি একুশে ফেব্রুয়ারিতেই এই ব্যানার-পোষ্টার তৈরির কাজটি করেছেন চারুশিল্পীরা। সে ঐতিহ্য-ধারা এখনো চলমান। রাত জেগে তাঁরা সেসব কাজ করতেন। এতে একদিকে যেমন থাকত উৎসবের আমেজ, তেমনি তাতে প্রকাশ পেত জাতিগত আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার সুতীব্র আকাঙ্খা। অগ্রজেরা উৎসাহ যুগিয়েছেন অনুজদের, তরুণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের। অগ্রজদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, রশিদ চৌধুরী, মুর্তজা বশির, দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুন কুন্ডু প্রমুখ শিল্পীগণ।(বণিক, ২০১৯:১৬) অনেক শিল্পীই ছিলেন যাঁদের নাম খুব জনপ্রিয় নয়। কিন্তু উত্তরকালে তাঁদের অনেকেই খ্যাতিমান বা জনপ্রিয় হয়েছেন। খ্যাতনামাদের সঙ্গে ছিলেন উদীয়মানরাও। যেমন, ঐতিহাসিক উনসত্তরের নানান কার্যক্রমে যে শিল্পীরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন মুস্তাফা মনোয়ার, ইমদাদ হোসেন, হাশেম খান, রফিকুন নবী; তেমনি ছিলেন শাহাদাত চৌধুরী, কেরামত মওলা, গোলাম সারোয়ার, আনোয়ার হোসেন, লুৎফর রহমান। এঁদের সঙ্গে আরো

ছিলেন প্রাণেশ মন্ডল, আবুল বারক আলভী, আব্দুল মান্নান, রেজাউল করিম, মনজুরুল হাই, সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, প্রফুল্ল রায়, নাসির বিশ্বাস, বিজয় সেন প্রমুখ শিল্পীরাও।(বণিক, ২০১৯:১৬) শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন, মিছিলে যোগ দিয়েছেন জনতার সঙ্গে। সাধারণ মানুষের আবেগকে তাঁরা যেমন স্পর্শ করেছেন, তেমনি আবার তাঁরা নিজেরাও স্পর্শিত হয়েছেন সাধারণের আবেগের দ্বারা। উভয় উভয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে; উভয় উভয়কে প্রভাবিত করেছে কর্মপ্রেরণায়, উজ্জিবীত করেছে পাকিস্তানী নয়া ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলমুক্তির আকাঙ্খায়। শিল্পীদের কৃত ব্যানারে, পোষ্টারে; রঙ ও রেখার কারুস্পর্শে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে জাতিগত মুক্তি-আকাঙ্খা। যে কারণে "ছাত্রজনতা" শব্দবন্ধটি যেমন যুক্ত হয়ে রয়েছে বাঙালির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে, তেমনি তাতে একই অনুরণনে যুক্ত করা যায় শিল্পীজনতা প্রত্যয়টিকেও। বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সার্বিক মুক্তি আন্দোলন- যাতে কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি-রাজনীতিক, চিত্রশিল্পী-সংগীতশিল্পী সকলের সম্মিলন ঘটেছিল। একটি সশস্ত্র সংগ্রামের সুদীর্ঘ প্রস্তুতিপর্বে, বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলনে এদেশের চারুশিল্পীদের অংশগ্রহণ, ভূমিকা ও অবদান অসামান্য উজ্জ্বলতায় ভাস্বর।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে চারুশিল্পীদের সম্পৃক্ততা :

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল মূলত পাকিস্তানের সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধচেস্টার স্বাভাবিক পরিণতি। যুদ্ধটা শুরু হয়েছে আগে থেকেই; তবে তা সশস্ত্র ছিলো না, সংস্কৃতিই ছিল একাত্তর-পূর্ব বাঙালির প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার। সমগ্র ষাটের দশক জুড়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ যে নতুন রূপে ফিরে আসে তার অন্তরপ্রেরণা ছিল বাঙালি সংস্কৃতি। বাঙালি সংস্কৃতির নবজাগরণের সূত্রেই বাঙালির জাতীয় জাগরণের সূচনা ঘটে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর কাছে বাঙালী সংস্কৃতি ছিল অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য এবং ভয়ের। তাদের এই মানসিক রুগ্নতা সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের কূপমন্ডূকতারই পরিচায়ক। তারা শুরু থেকেই তাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পূর্ব বাংলার সমাজকে ইসলামীকরণে। বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে মুছে দিয়ে তাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় মুসলমান বানাবার প্রকল্প নিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকেরা। নিষিদ্ধ করেছে রবীন্দ্রসংগীত– এই ধারণা থেকে যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু এবং তা ইসলামের ও মুসলমানের সঙ্গে বেমানান! প্রস্তাব করা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য উপযুক্ত রবীন্দ্র সংগীত লিখে নিতে! এ থেকে সংস্কৃতি সম্পর্কে পাকিস্তানী শাসকদের ব্যুৎপত্তিগত শূণ্যতার একটি ধারণা পাওয়া যায়। রবীন্দ্র সংগীত যে শ্যামা সংগীত নয় যে তা ইচ্ছে করলে অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়া যাবে- সে জ্ঞান পাকিস্তানী শাসকদের থাকবার কথা নয়। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষাকেও তারা বদলে দিতে চেয়েছে। আসলে তারা ভয় পেয়েছে বাঙালির সংস্কৃতিকে। তাই আক্রমণ করেছে ভাষা। কেননা ভাষা হচ্ছে মানুষের সংস্কৃতির মৌল উপাদান। ভাষা অবশ্য নিজেই এক সংস্কৃতি। পাকিস্তানে বাঙালিরা যে পরাধীন এই চেতনা শিল্পীর মানসলোকে আছড়ে পড়েছে শুরু থেকে। কেননা যে আদর্শের উপর পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা তা শিল্পীর স্বাধীনতা-বিরুদ্ধ। কেননা "মুসলমানদের রাষ্ট্র পাকিস্তানে" ছবি আঁকা ছিল এক প্রকার "শাস্ত্রবিরুদ্ধ" কাজ।(চৌধুরী, ২০১১:১২) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই নতুন রাষ্ট্রে সরকারের পদস্থ একজন কর্মকর্তা (এডিপি আই) এই মর্মে সরকারি নথিতে নোট লিখেছিলেন যে "ইসলামী রাষ্ট্রে ছবি আঁকার শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোনো স্কুল থাকতে পারে না"।(চৌধুরী, ২০১১:১২) শাসকগোষ্ঠীর নীতি-আদর্শের বিষয়টিই মূলত ঐ পদস্থ কর্মকর্তার এ বক্তব্যের ভেতর দিয়ে ফুঁটে উঠেছে। কিন্তু বাঙালিরা ছবি এঁকেছেন। কেননা, ছবি আঁকা বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমান হবার জন্যে তারা পাকিস্তান চায় নি।

শিল্পী কামরুল হাসান

সমগ্র মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় জুড়ে বাংলাদেশের শিল্পীগোষ্ঠী নানাভাবে সম্পৃক্ত থেকেছেন যুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে যেমন, তেমনি সম্মিলিতভাবে। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের সমান্তরালে চলমান সাংস্কৃতিক মুক্তি সংগ্রাম বেগবান করেছে রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্খা। এ সময়ে চিত্রশিল্পীদের সকল কাজের উপজীব্য হয়ে উঠেছে রাজনীতি। শিল্পের জন্য শিল্প তত্ত্ব বাতিল হয়ে যায় অবলীলায় জাতিগত মুক্তির সুতীব্র অভিপ্সার কাছে। পটুয়া কামরুল হাসানের তুলিতে আঁকা বর্বর ইয়াহিয়া খানের একটি মুখচ্ছবিতে মূর্ত হয়ে ওঠে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর লোলুপতা আর পাশবতা। ইয়াহিয়ার মুখাবয়বের ওই ব্যঙ্গচিত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল একদিকে যেমন শোষকের জান্তবতা তেমনি তাতে ছিল বর্বরতার বিরুদ্ধে বাঙালির তীব্র ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ। শিল্পী কামরুল হাসানকৃত সেই কার্টুন ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক প্রতিবাদের বড় এক প্রতীকি উপস্থাপনা। পঁচিশে মার্চের রাতে হানাদার বাহিনী বাঙালিদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ার আগেই কামরুল হাসান শাসক ইয়াহিয়া খানের ওই ছবি এঁকেছিলে তেইশ মার্চ। শোনা যায় এঁকে তিনি নিজেই তার কয়েকটি কপি টাঙ্গিয়ে দিয়েছিলেন শহিদ মিনারে। তখন তার ক্যাপশন ছিল "এই জানোয়ারটা আবার আক্রমণ করতে পারে।"(চৌধুরী, ২০১১:১৪) শিল্পীর সেই ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হয়ে দেখা দেয় এর দুদিন বাদে। তখন তিনি আবার আঁকেন ইয়াহিয়ার ছবি এবং ক্যাপশন বদলে লেখেন "এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে।" এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় শিল্পীরা কতখানি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। শিল্পীর তুলির আচড়ে ফুটে ওঠা ইয়াহিয়ার মুখচ্ছবি কেবল ব্যক্তির নয়; সেটি ওই শ্রেণির। ক্যাপশনে "জানোয়ারটা" থেকে "জানোয়ারদের" হয়েছে; অর্থাৎ বিশেষ থেকে নির্বিশেষে পরিবর্তন হয়েছে ধারণার। জানোয়ারের ধারণাটি দার্শনিকতায় সংশ্লেষিত হয়েছে নিপীড়নকারী শাসকের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে। নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অতর্কিতে ঝাপিয়ে পড়ার প্রতিশোধস্পৃহাটা তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছিল কামরুল হাসানের ছবির ওই ক্যাপশনে। নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামে মুক্তিকামী বাঙ্গালির মরণপণ যুদ্ধে কামরুল হাসানের সেই পোষ্টার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা ও প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে রাখতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। শহীদ মিনার হচ্ছে বাঙালির সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতীক। সে মিনার হানাদার বাহিনী গুড়িয়ে দিতে দেরি করেনি; কেননা তা তারা পঁচিশে মার্চের কালো রাতেই সম্পন্ন করে। এ থেকে বোঝা যায় বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি তাদের বিদ্বেষ কত তীব্র ছিল। "অপারেশন সার্চলাইট" নামক যে গণহত্যার সূচনা হয় মার্চের কালো রাতে তার অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিল বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের সূতিকাগার বলে বিবেচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠেছিল পূর্ব বাংলার মানুষের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জাগরণের পীঠস্থান। মনে করা হয়, একাত্তরের পাক দস্যুরা যতোটা ক্ষিপ্ত ছিল

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর, ততটা তারা অন্য পেশাজীবিদের ওপর ছিলো না। এর মধ্যে তাদের বিদ্বেষ অধিক ছিল "কলা শাস্ত্রের শিক্ষকদের উপর।"(চৌধুরী, ২০১১:২৫৫) চারুকলা নিঃসন্দেহে এই কলা শাস্ত্রের মধ্যে অন্যতম।

কামরুল হাসান যেমন স্বাধীকার আন্দোলনে ছিলেন, সংগ্রামে ছিলেন; গিয়েছিলেন তেমনি যুদ্ধেও। তাঁর মতো আরো অনেক শিল্পীই যোগ দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের মহাক্ষেত্রে। মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির জাগরণের যুদ্ধ, তার নতুন করে হয়ে ওঠার সংগ্রাম। তাই সে সংগ্রামে শিল্প ও শিল্পীর প্রয়োজনীয়তা ছিল খুব বেশি রকমের। কেননা মুক্তিযুদ্ধ তো কেবল দৃশ্যমান শত্রুকে পরাজিত করবার বিষয় ছিল না; তা ছিল মতাদর্শগত ও মজ্জাগত অদৃশ্য শত্রুকে অবলোপনের ব্যাপারও। বাঙালির জন্যে নিজেকে নতুন করে সৃষ্টি করার ব্যাপারটিও জড়িয়ে ছিল সে যুদ্ধের সঙ্গে। সঙ্গত কারণেই মুক্তিযুদ্ধ তাই হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত সৃজনশীল একটি বিষয়। তার ছোঁয়া যেমন লেগেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের রণকৌশলে, তেমনি তার আভাস মেলে ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনায়। যেমন যুদ্ধকালীন সময়েই চিন্তা করা হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা কি হবে। চারুশিল্পী, ভাষাশিল্পী, সংগীতশিল্পী, রাজনীতির শিল্পী– সবাই মিলে তাঁদের সৃজনীশক্তি, শ্রমশক্তি নিয়োগ করেছেন দেশমাতৃকার রূপ পরিকল্পনায় ও তাকে গড়ে তুলবার জন্য কর্মপরিকল্পনা নির্ধারনে। কলকাতায় বাংলাদেশের শিল্পীদের নিয়ে যে গানের স্কোয়াড গড়ে তোলা হয়, তাতে চিত্রশিল্পীদেরও অংশগ্রহণ ছিল। তাই মুক্তির গানের দলের সঙ্গে যেমন যুক্ত ছিলেন ওয়াহিদুল হক, সনজিদা খাতুন, তেমনি তার সঙ্গে ছিলেন মুস্তাফা মনোয়ার, স্বপন চৌধুরী, গোলাম মাওলা, বীরেন সোম প্রমুখ চিত্রশিল্পীগণ। মুক্তি সংগ্রামী শিল্পীদল ভারতের বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীত পরিবেশন করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য মানুষের সহানুভূতিকে যেমন জাগরূক রাখেন, তেমনি তাঁদের গাওয়া সঙ্গীতে উজ্জীবিত হয়েছেন দেশে-বিদেশে অবস্থানরত/যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী বাঙালি। গান গেয়ে পাওয়া অর্থ তুলে দেওয়া হয় শরণার্থী ফান্ডে। সংগীত শিল্পীদের সে পরিবেশনার ক্ষেত্রে "চিত্রশিল্পীদের কাজ ছিল অনুষ্ঠানের সেট ডিজাইন ও ব্যাকসিন অংকন করা"। (বণিক, ২০১৯:২১) মুক্তিযুদ্ধকালীন সে গানের দলের কর্মকান্ড নিয়ে চিত্রপরিচালক তারেক মাসুদ নির্মাণ করেছেন বিখ্যাত ডকুমেন্টারি "মুক্তির গান"। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নানান কর্মকান্ডে যুক্ত ছিলেন চিত্রশিল্পীদের অনেকে। এঁদের মধ্যে শিল্পী বীরেন সোম শিল্পী কামরুল হাসানের নির্দেশে যোগ দিয়েছিলে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে। প্রবাসী সরকারে চিত্রশিল্পীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি ফুটে উঠেছে বীরেন সোমের নিজের বর্ণনায়–

শিল্পী প্রাণেশ মণ্ডল

> "ডিজাইনার হিসেবে আমি মন্ত্রণালয়ের কাজে যোগদান করলাম। কামরুল হাসান পরিচালক; নিতুন কুন্ডু, দেবদাস চক্রবর্তী, নাসির বিশ্বাস ও প্রাণেশ মন্ডল এঁরা সবাই ডিজাইনার। আমরা নিয়মিত কাজ শুরু করলাম। মোট আটজন লোক নিয়ে শুরু হলো তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা শাখা। ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে ছিল আমাদের অফিস। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অফিস। কামরুল হাসান আমাদের সবাইকে নিয়ে

> বসতেন। কী ধরণের কাজ আমরা করব খোলামেলা আলোচনা করে তিনি তা বুঝিইয়ে দিতেন। প্রথম দিকে মনোগ্রাম, পোষ্টার, কার্টুন, লিফলেট, ব্যানার ডিজাইন ইত্যাদি করতে হতো।"(বণিক, ২০১৯:২২-২৩)

সমগ্র মুক্তিযুদ্ধজুড়ে যে দিগন্তপ্লাবী সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটে তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার চিত্রশিল্পীদের কৃত পোষ্টার। কেননা, সেসব পোস্টারের ছবি ও বাণীতে (ক্যাপশনে) মূর্ত হয়ে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের মৌলচেতনাসমূহ; যথা- ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা, সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানবীয় সংস্কৃতি ইত্যাদি। মোট কথা বাঙালির জাতিগত স্বপ্ন-আকাঙ্খা-পরিচয়, দ্রোহ-বিপ্লবের চেতনা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে মূলত পোস্টারের ভেতর দিয়ে এবং সেগুলো সহজেই দেশি বিদেশি নানান গণমাধ্যম মারফত জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়। এ সময়ের কয়েকটি বিখ্যাত পোস্টার হচ্ছে " 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খৃস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান আমরা সবাই বাঙালি', 'সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী', বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা', 'একেকটি বাংলা অক্ষর অ আ ক খ একেকটি বাঙালির জীবন', বাংলাদেশের সম্পদ বৃদ্ধি করুন পাকিস্তানী পণ্য বর্জন করুন', 'বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক ছাত্র যুবক সকলেই আজ মুক্তিযোদ্ধা', 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেবো' " ইত্যাদি। (বণিক, ২০১৯:২৩)

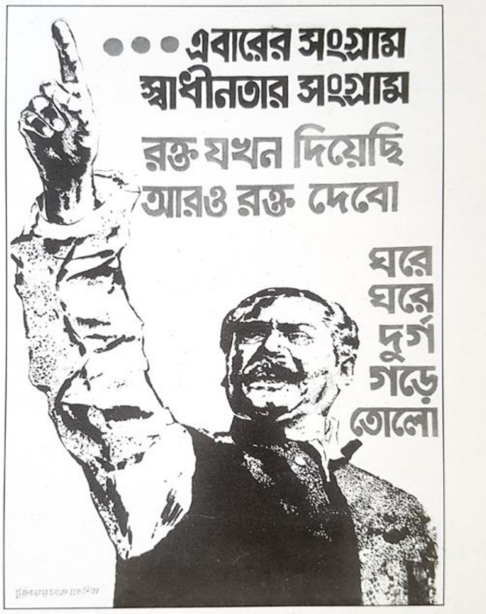

শিল্পী বীরেন সোম

পোস্টারগুলোর ক্যাপশন থেকেই অনুমান করা যায় কী সুতীব্র ব্যঞ্জনায় সেগুলো একটি জাতিগত আকাঙ্খাকে মূর্ত করে তুলেছিল। এরকম অনেক প্রতীকি তাৎপর্যে মন্ডিত পোস্টার ও মনোগ্রাম দেশের চারুশিল্পীরাই সৃষ্টি করেছিলেন যার ভেতর দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাগত বিষয়গুলো দৃশ্যরূপ পায়। বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যময় ভাষণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উচ্চারণকে উপজীব্য করে তৈরি করা হয় অনেক পোস্টার। এর মধ্যে শিল্পী বীরেন সোম ও শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তীর কৃত পোস্টার 'ঘরে ঘরে দুর্গ গরে তোলো' এবং 'রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেবো' উল্লেখযোগ্য। উল্লেখিত এই পোস্টারদুটির মধ্যে প্রথমটি করেছিলেন শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচারবিভাগ এটিকে প্রচার করে যার ভেতর দিয়ে চলমান মুক্তিযুদ্ধের জাতীয়তাবাদী রূপটি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিচিতি পায়।

সুতরাং যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হচ্ছে পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনকালব্যাপী অন্যান্য শ্রেণি-পেশার মানুষের মতো এদেশের চিত্রশিল্পীরাও সম্পৃক্ত, সক্রিয় ও সরব ছিলেন বাঙালির স্বাধীকার অর্জন আন্দোলনের নানান পর্বে ও প্রক্রিয়ায়। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ষাটের দশকের শেষ পর্বের গণঅভ্যুত্থান পেরিয়ে সত্তরের দশকের সূচনালগ্নে সংঘটিত অনন্যসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে চিত্রশিল্পীগণ তাঁদের সৃজনীশক্তি নিয়ে কর্মতৎপর থেকেছেন সহযোদ্ধা হিসেবে। বাংলাদেশের

মুক্তিযুদ্ধের একটি বড়ো দিক হলো এর সাংস্কৃতিক পটভূমি– যার বিনির্মাণে অন্যান্য শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে চিত্রশিল্পীগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালীদের পরাধীনতার গ্লানিবোধ শিল্পীদের মানস লোককে দ্রোহদীর্ণ করেছে; তাঁদের সৃজন-কল্পনা পরাধীন বাঙালির ঔপনিবেশিক প্রতিরোধ আন্দোলনে তথা জাতিগত মুক্তি সংগ্রামে সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান প্রমুখ শিল্পীগণ তাঁদের কর্মতৎপরতার ভেতর দিয়ে বিপুল প্রেরণা ও নির্দেশনা দিয়েছেন জাতির সেই জেগে ওঠা এবং হয়ে ওঠার দিনগুলোতে; তাঁদের কাজের মর্মবাণী জনমানসকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছে স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে। আমিনুল ইসলাম কৃত "হিউম্যানিটি ক্রুসিফায়েড" নামক তেলরঙের ছবিতে ১৯৫২ সালেই রূপায়িত হয়েছিল একুশে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণের ঘটনা। (আনিসুজ্জামান, ২০১৩:১৫৪) হাসান হাফিজুর রহমান সংকলিত ও সম্পাদিত প্রকাশনা একুশে ফেব্রুয়ারি"র প্রচ্ছদ তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে উঠেছিল চিত্রশিল্পীদের রঙ ও রেখার বিন্যাসে। সে সংকলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম, বিজন চৌধুরী ও মুর্তজা বশির। (আনিসুজ্জামান, ২০১৩:১৫৫) স্বাধীকার আদায় আন্দোলনের সমগ্র সময় জুড়ে সাহিত্য ও শিল্পকলার যৌথ প্রবাহে অগ্রসর হয়েছে বাঙালি সংস্কৃতি; শাণিত হয়েছে বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনা। আর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে চিত্রশিল্পীরা সশরীরেই উপস্থিত ছিলেন যুদ্ধের ময়দানে। প্রত্যক্ষ যুদ্ধে যাঁরা যেতে পারেননি তাঁরা পরোক্ষ যুদ্ধে শামিল হয়েছেন। কোনো কোনো শিল্পী পাক বাহিনীর হাতে নির্যাতিত হয়েছেন; জুনাবুল ইসলাম, আবু তাহের এঁদের মধ্যে অন্যতম। (ইসলাম, ১৯৯৫:৪৬)

সাতচল্লিশ উত্তর পূর্ব বঙ্গে যে বিদ্রোহের সুর বেজে চলছিল দেশের চিত্রশিল্পীরা সে সুরকে ধারণ করেছিলেন তাঁদের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিতে। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে তাঁরা সে সুরকে মূর্ত করে তুলেছেন সবার আগে। কামরুল হাসান যেমন ঢাকায় বসে তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে অনেকখানি আগাম দেখতে পেয়েছিলেন শাসকগোষ্ঠীর বর্বরতার; তেমনি ঢাকার বাইরে, যাঁরা ছিলেন চট্টগ্রামে, তাঁরাও টের পেয়ে গিয়েছিলেন বাঙালির সম্ভাব্য বিদ্রোহের। একাত্তরের মার্চে তাঁরা প্রকাশ করেন "বাংলায় বিদ্রোহ" নামক ছাপচিত্রের একটি সংগ্রহ। প্রকাশনার শিরোনামই বলে দেয় শিল্পীর চোখ ভবিষ্যতের কত দূর দেখতে পাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে বিদ্রোহের উপাদান যেমন ছিল, তেমনি ছিল বিপ্লবেরও উপাদান। চট্টগ্রামের শিল্পীদের সে প্রকাশনায় যাঁদের চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছিল তাঁরা হলেন রশিদ চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, মিজানুর রহমান, সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, আনসার আলী ও সবিহ উল আলম। (আনিসুজ্জামান, ২০১৩:১৭৫) মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ধরে চিত্রশিল্পীরা নিরলস কাজ করে গেছেন দেশমাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে। অনেকখানিই অন্তরালে থেকে গেছে তাঁদের সেই সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে, আগস্ট মাসে, কলকাতায় বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীদের যে প্রদর্শনী হয় তা উল্লেখযোগ্য। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন কামরুল হাসান, দেবদাস চক্রবর্তী, মুস্তাফা মনোয়ার শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের নেতৃত্বে চিত্রশিল্পীদের নিয়ে গঠিত হয় "বাংলা চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদ" ।(ইসলাম, ১৯৯৫:৪৬) সুতরাং "সংগ্রাম পরিষদ" শব্দটির সঙ্গে কেবল রাজনীতি নয়, জড়িয়ে ছিল শিল্প ও সংস্কৃতির বিষয়টিও। "ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" বা "সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ"-এর মতো যদিও শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ প্রত্যয়টি আমাদের প্রচলিত ইতিহাসের বয়ানে অনুপস্থিত থেকে গেছে।

উপসংহার :

বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধে দেশের চিত্রশিল্পীগণ ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত থেকে ইতিহাস নির্মানে অংশীদার হয়েছেন। তাঁদের সৃজনকর্মের ভেতর দিয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনা ও রাজনৈতিক সচেতনতা সংশ্লেষিত হয়ে জাতিগত মুক্তির সংগ্রামের স্রোতধারাকে শক্তিমান করেছে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ অবধি বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ

সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের পুষ্টি সাধন ও বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পীরা অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন। চিত্রিশিল্পীরা তাঁদের সৃজনীকল্পনার নানামুখী প্রকাশের ভেতর দিয়ে বাঙালির ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করে তাকে ঋদ্ধ করেছেন। সমাজের সবচেয়ে যাঁরা সংবেদনশীল ও সৃজনশীল তাঁরাই তো শিল্পী হন। সাংস্কৃতিক পরাধীনতার বোধ তাঁদেরকে স্বাভাবিকভাবেই সংযুক্ত করেছে রাজনীতির সঙ্গে। তাঁদের অন্তরবেদনা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে স্বাধীকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক পটভূমিতে। বুদ্ধিজীবি বলতে সাধারণত যাদেরকে বোঝায় তাদের সকলে যে দেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন এমন নয়; তাদের অনেকেই ছিলেন পাকিস্তানী আদেশের সমর্থক। "যাদেরকে দালাল বলা হয় তাদের শতকরা হার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যতো বেশি ততো অন্য কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে নয়"। (চৌধুরী, ২০১১:৯৪) এই সাধারণ অর্থে পরিচিত বুদ্ধিজীবীদের থেকে চিত্রশিল্পীগণ নিশ্চয়ই একটি আলাদা গোষ্ঠী ছিলেন। কেননা "একজন চারুশিল্পীও ফ্যাসিবাদী পাক সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের বিরোধীতা করেছেন এমন শোনা যায়নি।"(ইসলাম, ১৯৯৫:৪৬) বাংলাদেশের সুদীর্ঘ স্বাধীকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে চিত্রশিল্পীদের সৃজনশীল কর্মকুশলতার ভেতর তৈরি হয়েছে ও প্রকাশ ঘটেছে জাতিগত আত্মপরিচয় নির্দেশক নানামাত্রিক চেতনা এবং নবীন রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক পরিচয় নির্দেশক চিহ্নায়নে তাঁদের কাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র :

আনিসুজ্জামান (২০১৩), *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিসাধক*, ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড।

ইসলাম, নজরুল (১৯৯৫), *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

উজ্জামান, হাসান (১৯৮১), *সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা*, ঢাকা: নলেজ ভিউ।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (২০১১), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, ঢাকা: কথা প্রকাশ।

বণিক, সুবলকুমার (সম্পা) (২০১৫, ২০১৯), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পীসমাজ*, বীরেন সোম, ঢাকা: চন্দ্রাবতী একাডেমি।

[Abstract: The liberation war as well as the independence-movement of Bangladesh can be considered both as a political and cultural revolt against the neocolonial regime of then West Pakistan. The liberation war was undoubtedly the pivotal image of nationalistic sentiment of the Bengali speaking people of our country. The war that continued for seven months, led to the emergence of Bangladesh as an independent and despotic nation by its end. But in the background of this independence there was a long period when people of then East Pakistan indulged in a secular Bengali nationalistic apprehension. This period can be considered as the preparedness of the independence movement of Bengalis which debuted by the movement for language in the year of 1952. The martyrs of 21st February, 1952, most of whom were students and youths, seeded the aspiration of independence among the people in that socio-political trajectory of this land; the consequence of which flourished the collective stream of language-culture and politics and that led to the war as well as confrontation regarding to our independence. By the period of 1952 to 1971, among the people from various classes and occupations, there were also the artists and painters who played unprecedented roles in the liberation war whose contribution was not mentioned remarkably. In fact, the pivotal force for the liberation war of Bangladesh was Bengalis' cultural apprehension and the profound outcome of which is the independence of a sovereign nation. The painters of Bangladesh here played a vital role for the upheaval of our nationalistic approach. They have energized the spirit of political movement of

1952, 1969 and 1971 by their dedicated creative endeavors. The painters have not only manifested diverse creative aptitudes by their artworks, but also many of them being engaged to the processions and rallies have enforced the power of the liberation war and the aspiration for independence. Painter Quamrul Hassan, Biren Shome, Pranesh Mandal, Murtaja Baseer, Shahabuddin Ahmed and some other painters have enriched Bengalis' rebellious apprehension by painting posters, banners, murals and wall-writings during that time. In this article I have been inclined to articulate the diverse contribution of the painters in the liberation war and independence-movement of Bangladesh. In this article, as per my observation, two exigent findings would be revealed- firstly, how the painters of Bangladesh (then East Pakistan) played significant role in constructing the nationalistic apprehension, and secondly, how they have become the pioneers of making the cultural consents being engaged directly to the liberation war of our country.]